জীবনের রকমফের

সামছুর রহমান ওমর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

জীবনের রকমফের

সামছুর রহমান ওমর

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম
প্রচ্ছদ : নাঈমা তামান্না
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ২৮০
পেপারব্যাক মূল্য : ২৫০

ISBN: 978-984-8254-56-1
Jiboner Rokomfer by Shamsur Rahman Omar, Published by Guardian Publications, Price TK. 280 (HC)/TK. 250 (PB) Only.

প্রকাশকের কথা

জীবন! শব্দটি ছোট্টো হলেও এই শব্দের সাথে মিশে আছে বহু ঘটনা। জীবনের পরতে পরতে ঘটে যায় বিভিন্ন ঘটনা। সেই ঘটনার রেশ থেকে যায় ব্যক্তি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা যেমন আমাদের আনন্দে উদ্বেলিত করে, আবার কোনো ঘটনা কষ্টে পতিত করে। মানুষ আনন্দের ঘটনাগুলো স্মরণ রাখে খুব কমই, কিন্তু কষ্টের কথা সহজে ভুলতে পারে না। আবার কষ্টের মাঝেও দুটি দিক থাকে; ইতিবাচক ও নেতিবাচক। যারা ঘটনাগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, তারা জীবনে সমৃদ্ধ হয়। আর যারা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে, তারা হতাশায় মুষড়ে পড়ে। তবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

লেখক সামছুর রহমান ওমর তার জীবনে ঘটে যাওয়া এবং আশেপাশের বিভিন্ন ঘটনাকে নিজের দৃষ্টিতে দেখার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, ঘটনাগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। এই বইয়ে যেসব ঘটনাকে আলোকপাত করা হয়েছে, সেসব প্রায়ই আমাদের কারও না কারোর সঙ্গে ঘটছে। এই কমন ঘটনাগুলো নিয়েই আমাদের নিত্য বসবাস। তাই বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে ‘জীবনের রকমফের’।

লেখক এই ঘটনাগুলো থেকে আমরা জীবনে কী কী শিক্ষা নিতে পারি– সেদিকেই আলোকপাত করেছেন। আশা করছি, এই বই আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। চলুন তাহলে ‘জীবনের রকমফের’- এর গল্পে প্রবেশ করি...

নুর মোহাম্মদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

লেখকের কথা

আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর আশা ছিল, এই আবিষ্কার মানব কল্যাণে বিরাট ভূমিকা রাখবে। কিন্তু হয়েছে উলটো। মানব কল্যাণের চাইতে মানুষের ধ্বংস সাধনে এই আবিষ্কারের ব্যবহার হয়েছে বেশি। রক্তক্ষয়ী সব যুদ্ধ, সংঘর্ষে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো এই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নিহত হয়েছিল লাখো মানুষ।

শেষ জীবনে নোবেল তাঁর এই আবিষ্কার নিয়ে ভীষণ অনুতপ্ত হয়েছিলেন। চোখের সামনে একের পর এক যুদ্ধ-বিগ্রহে ডিনামাইটের অপব্যবহার তাঁকে দারুণ পীড়া দিয়েছিল।

এক অভিনব উপায়ে তিনি এর প্রায়শ্চিত্ত করলেন। নিজের সঞ্চিত ও উপার্জিত সব অর্থ তিনি ট্রাস্টে দান করে গেলেন। ঠিক হলো, এখন থেকে প্রতি বছর ট্রাস্ট থেকে পুরস্কার দেওয়া হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা মানব কল্যাণে অবদান রাখবেন, তাদের মধ্যে বাছাইকৃত সেরা কয়েকজনকে পুরস্কৃত করা হবে।

১৯০১ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। আলফ্রেড নোবেল-এর স্মরণে এর নাম রাখা হয় নোবেল প্রাইজ। বর্তমান বিশ্বে নোবেল প্রাইজকে সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই সময়ের আলোচিত যোগাযোগ মাধ্যম ‘ফেসবুক’। মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি, একে অন্যের সাথে ছবি, স্মরণীয় ঘটনা আদান-প্রদান, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের একে অন্যের সাথে যুক্ত থাকার প্রয়াসেই ফেসবুকের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে উদ্দেশ্যে ফেসবুকের জন্ম, তার চাইতে অপকাজেই এর ব্যবহার হচ্ছে বেশি। ঝগড়াঝাটি, মারামারি, কাটাকাটি, গালিগালাজ, একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকা, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, ট্রল, প্র্যাংক, অন্যকে আঘাত করে বিনোদন লাভ, নানা ধরনের গুজব ছড়ানো...ফেসবুক রীতিমতো এক বাজার। কে জানে, ফেসবুকের বর্তমান ব্যবহার দেখে হয়তো এর প্রতিষ্ঠাতাও একদিন আলফ্রেড নোবেলের মতো আফসোস করবেন!

শুধু ফেসবুকেই নয়; জাতীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক... সব অঙ্গনেই এই প্রবণতা দেখা যায়। আমাদের আড্ডা, আলোচনার বিরাট অংশ জুড়ে থাকে অন্যের সমালোচনা। অন্যের সমালোচনা করে আমরা আনন্দ খুজে পাই। অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলেই আমরা সময় পার করি। কিন্তু, নিজের জীবন নিয়ে ভাবার মতো সময় আমাদের নেই।

অন্যের ত্রুটি খুঁজতে আমরা যত ব্যস্ত, নিজের জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো কি একইভাবে তলিয়ে দেখি? আমরা কি ভাবি, আমার জীবনে কি কি ভুল আছে? আমরা কি ভাবি, কীভাবে ভুল-ত্রুটি শুধরে নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়া যায়? কীভাবে সবার ভালোবাসায় নিজের জীবনকে সিক্ত করা যায়?

'জীবনের রকমফের' পাঠকদের চিন্তার জগতে আলোড়ন তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। শুধু নিজের আত্মশুদ্ধিই নয়; আমাদের সমাজে চলে আসা বিভিন্ন ধ্যানধারণা ও মানসিকতা নিয়ে নতুন করে ভাবাবে। পাঠক যুক্তির নিরিখে সবকিছু নতুন করে দেখার তাগিদ অনুভব করবেন।

ফিচার, রম্য ও গল্পের মিশেলে সাজানো হয়েছে বইটি। আত্মশুদ্ধি, চিন্তা, বোধ, রাগ, দুঃখ, হাসি, আনন্দ, প্রেম, ভালবাসা...এক জীবনের সব অনুভূতির স্বাদই পাঠক এতে খুঁজে পাবেন।

সুপ্রিয় পাঠক, 'জীবনের রকমফের' আপনার কাছে কেমন লাগল? আপনার অনুভূতি জানাতে ভুলবেন না যেন!

সামছুর রহমান ওমর
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
sromar83@gmail.com

সূচিপত্র

কথার ব্যথা	১১
নারীর পোশাক	১৭
মানব ধর্মের ব্যবচ্ছেদ	২৩
এমন একটি মসজিদের স্বপ্ন দেখি	৩০
খবরের সত্যতা যাচাই	৩৫
চকচক করলেই সোনা হয় না	৪৩
বহুবিবাহ ও বিধবা বিয়ে : সময়ের অনিবার্য দাবি	৪৭
ভালোবাসা দিয়ে কাছে টানুন	৫৩
নারী মানেই প্রেমিকা নয়	৫৭
হতেম যদি অস্ট্রেলিয়ার মুক্ত কোনো পাখি...	৬২
রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন	৬৬
নাম-বেনামের আমলনামা	৭২
সমালোচনার রকমফের	৭৯
Sex Education	৮৩
বুদ্ধি বেশি কার; মানুষ না আল্লাহর	৯১
আবেগ নয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির চাষাবাদ দরকার	১০০
দ্বীনপ্রিয় যুবক ভাইদের প্রতি অনুরোধ	১০৪
পরমত সহিষ্ণুতা	১০৮
ফ্যাশনেবল হিজাব	১১১
দাম্পত্য	১১৪
আত্মহত্যা মহাপাপ; কোনো সমাধান নয়	১১৮
জীবনের সুখ-দুঃখ	১২৩
জন্মদিন সমাচার	১২৮
বয়ঃসন্ধি	১৩৪
Just friends	১৪২
Sex Worker	১৪৮
একটি মোবাইল ফোন এবং একটি দীর্ঘশ্বাসের গল্প	১৫৭
বিয়ে কোনো ওষুধের নাম নয়	১৬৫
একই সমতলে	১৭৫

কথার ব্যথা

এক

ছোটোবেলায় একটা কৌতুক শুনেছিলাম।

এক দম্পতি ডাক্তারের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন– 'ডাক্তার সাহেব! আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই ফর্সা, কিন্তু আমাদের বাচ্চা হয়েছে কালো। সবাই আমাদের জিজ্ঞাসা করে– আপনার দুজনই ফর্সা, কিন্তু বাচ্চা কালো কেন? বলুন তো কী জবাব দিই?'

ডাক্তার উত্তর দিলেন– 'বলবেন, আমার বাচ্চা লোডশেডিংয়ের সময় জন্ম নিয়েছে, তাই এমন কালো হয়েছে।'

কৌতুকে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু বাস্তবে!

আমাদের সমাজে এ ধরনের প্রশ্ন খুব সহজলভ্য। অনেকেই আগ বাড়িয়ে এ ধরনের প্রশ্ন করেন। একরাশ বিস্ময় নিয়ে চোখ কপালে তুলে বলেন– 'তোমাদের দুই বোনের মধ্যে তো কোনো মিলই নেই! তোমার বোন এত ফর্সা, কিন্তু তুমি এমন কেন? তোমার গায়ের রং ময়লা কেন?'

আচ্ছা, এই প্রশ্নের উত্তর কী হতে পারে? মানুষ আসলে এ কথা বলে কী জবাব আশা করে? খেয়ালের বশে, হাসি-ঠাট্টা কিংবা অহেতুক কৌতূহলে করা এমন কথা আরেকটি মানুষের বুকে যে কি বিদীর্ণ দুঃসহ শেল হয়ে আঘাত করে, সে খবর কি কেউ রাখে?

রাখে না। রাখে না বলেই এমন প্রশ্ন, সাদাসিধে ভাব ধরা মুখের এই যন্ত্রণাময় কথা হাজারো মানুষের নীরব অশ্রু ঝরায়। আড়ালে অনেকেই কাঁদে। বিধাতাকে একরাশ অভিমানে প্রশ্নবিদ্ধ করে– 'কেন? হে দয়াময় প্রভু! আমিই কেন?'

আমার নিজের জীবনের একটা গল্প বলি। বেদনার গল্প, বুকফাটা আর্তনাদের গল্প।

দুই

আমার দুই ভাগনি। পিঠাপিঠি দুইবোন। বয়সের ফারাক বছরখানেক মাত্র।

বড়ো বোনটা দেখতে ফর্সা, পড়ালেখায় ভালো। ছোটো বোনটার গায়ের রং শ্যামলা, পড়ালেখায় কিছুটা পিছিয়ে।

কিন্তু মেয়েটার গানের গলা অসাধারণ। আমরা মুগ্ধ হয়ে তার দরাজ গলার হামদ-নাত শুনতাম। মেয়েটার সারা শরীর-মনজুড়ে আশ্চর্য মমতা। মানুষ, পশু-পাখি সে মমতার ভাগ কারও ক্ষেত্রেই কম নয়।

ভাই-বোনের মধ্যে কত ঝগড়া হয়, লাগালাগি হয়, কথা বন্ধ থাকে; আবার মিলে যায়। কিন্তু ওর সাথে কারও কোনো ঝগড়া নেই। ঝগড়া করার কোনো সুযোগ সে কাউকেই দেয় না। পরম মমতায় সবাইকে ঘিরে রাখে। সবার সুবিধা-অসুবিধা ভালো-মন্দের দিকে খেয়াল রাখে। আগ বাড়িয়ে জানতে চায়– 'মামা! খুব গরম লাগছে? শরবত বানিয়ে দিই?'

জবাব দেওয়ার আগেই হয়তো শরবত বানিয়ে হাজির।

সবার ছোটো বোনটিকে নিজ হাতে খাইয়ে দেয়, যত্ন করে। এমন মমতাময়ী মেয়ের ওপর কি রাগ করা যায়? নাকি রাগ পুষে রাখা যায়?

কিন্তু সমাজের নিয়ম– আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী। আগন্তুক আগ বাড়িয়ে ওর চেহারা নিয়েই কথা বলে, গুণের খবর আর রাখে না।

স্কুলে বান্ধবীরা ওকে দেখিয়ে বলে– 'আরে, ওর বড়ো বোনকে যদি দেখতে! যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন পড়ালেখায় ভালো; ও তো তার তুলনায় কিছুই না।'

অনেক মুরব্বিরা এসে সহানুভূতি দেখাত– 'যাক! বড়োটার চেহারা এমন হয়নি, নইলে দেখা যেত– বড়োটাকে দেখতে এসে ছোটোটাকে পাত্রপক্ষ পছন্দ করে ফেলেছে। চোখের সামনে এমন কত ঘটনা দেখেছি!'

কেউ জানত না, মেয়েটা আড়ালে চোখের পানি ফেলত।

ক্লাস সেভেনে এসে সে হঠাৎ করে খুব সিরিয়াস হয়ে গেল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে মনোযোগ দিয়ে শুরু করল পড়া। চেহারায় না হোক, অন্তত পড়াশোনায় বড়ো বোনের মতো হতে দোষ কি!

কিছুদিন পরে দেখা গেল, মেয়ের চেহারা শুকিয়ে গেছে। চোখে-মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। আমরা ভাবি, বেশি পড়াশোনা আর পরিশ্রমের কারণে মেয়ের এই হাল হয়েছে।

ওকে বোঝাই– 'মা রে! এত চাপ নিস না। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টই কি সব? আগে শরীরটাকে ঠিক রাখ।'

মেয়ে ক্লান্ত ঠোঁটে হাসে। অভয় দেওয়ার হাসি। কিন্তু আমরা চিন্তিত, কী হলো ওর?

শুরু হলো ডাক্তার দেখানো। এই ডাক্তার, সেই ডাক্তার। কত ওষুধ, কত কিছু। কিন্তু শরীর আর সারে না; দিনদিন দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হচ্ছে।

অবশেষে যা জানতে পারলাম, তাতে পুরো পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এ যে অবিশ্বাস্য! এ যে অকল্পনীয়! ডাক্তারের রিপোর্ট বলছে, মেয়েটা লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত; রক্তরোগ, ক্যানসার।

পরের দেড়টা বছর গোটা পরিবার আশা-নিরাশার এক নাগরদোলার মধ্য দিয়ে গেল। দেশে কিছুদিন চিকিৎসা শেষে নিয়ে যাওয়া হয় কোলকাতা। একের পর এক কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিদিন নানা টেস্ট, রক্ত পরীক্ষা, রক্ত দেওয়া, ইনজেকশন, এটা-সেটা চলতে থাকে।

মেয়ে নীরবে কাঁদে– ব্যথায়, যন্ত্রণায়। বাবা-মাকে দেখে দ্রুত চোখের পানি মুছে ফেলে। হাসি হাসি মুখ করে বলে– 'কই না তো কিছু হয়নি, মনে হয় চোখে কিছু পড়েছে।'

আমাকে দেখে বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে– 'মামা! আমার জন্য তোমরা কত কষ্ট করছ! তোমাদের কত কষ্ট হচ্ছে। জানি, আব্বু-আম্মুও আমার জন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছে। ইস! যদি সবার কষ্ট দূর করে দিতে পারতাম, যদি কারও কষ্টের কারণ না হতাম!'

আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। এই অবস্থায়ও নিজের কষ্ট নিয়ে তার কোনো আফসোস নেই। আমাদের কষ্ট হচ্ছে– এই ভেবে সে নিজের কাছে লজ্জিত, চিন্তিত, অপরাধী।

কখনো কখনো বলত– 'জানো মামা! একসময় নিজের চেহারা নিয়ে খুব আফসোস হতো। ভাবতাম, আল্লাহ কেন আমাকে এমন করে বানালেন? কেন আমার চেহারাটা আপুর মতো হলো না? এখন মনে হয়– ওসব কিচ্ছু চাই না। আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ করে দেন। আমি আবার ফিরে যেতে চাই স্কুলে। স্কুলের সামনে বান্ধবীদের সাথে ফুচকা খেতে খুব ইচ্ছে করে।

যারা আমার চেহারা নিয়ে কথা বলেছে, যারা আমার মনে চেহারা নিয়ে আফসোসবোধ ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাদের যদি হাতের কাছে পেতাম! তবে খুব একচোট ঝগড়া করতাম। বলতাম, কেন আপনার এসব কথা বলেন? কেন এসব বলে বলে অহেতুক আক্ষেপে আমাদের মনটা ভারী করে তোলেন? মানুষের চেহারার চাইতে যে জীবনের মূল্য অনেকখানি, অনেক অনেক বেশি!'

মানুষ কী ভাবে আর কী হয়!

দীর্ঘ চিকিৎসা শেষে জানা গেল, এই রোগ আর ভালো হওয়ার নয়। এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে; শেষ বারের মতো। অনন্ত পথের যাত্রা শুরুর আগে সবার কাছ থেকে যে বিদায় নেওয়া চাই!

হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, আয়া সবার সাথে ওর সুন্দর সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। ফেরার দিন সিঁড়ি দিয়ে নিচের লন পর্যন্ত সবাই এগিয়ে এলো। হাত নেড়ে বিদায় দিলো। অনেক অনেক উপহারে ওর প্রতি ভালোবাসা জানাল। অল্প দিনেই মমতাময়ী মেয়েটা সবার মন জয় করে নিয়েছিল।

তারপর?

তারপর আর কী; মেয়েটা এখন ধুলোপড়া চিঠি।

অনেক কাজের ভিড়ে কখনো কখনো চমকে উঠি, যেন সেই পরিচিত কণ্ঠ আমাকে এসে বলছে– ‘মামা! এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দিই?’

তিন

এই যে কথা বলা, হাবভাবে উঠতে-বসতে অন্যকে কথার হুল ফোটানো, অন্যের দুর্বলতা নিয়ে নানা তীর্যক বাক্যবাণে বিদ্ধ করা– কিছু লোকের মজ্জাগত স্বভাব; এতেই তাদের আনন্দ। তার কথায় অন্য মানুষের মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আরেকটা মানুষ কী নিদারুণ মর্মজ্বালায় বিদ্ধ হচ্ছে, তার কোনো খবরই এরা রাখে না।

মাঝে মাঝে অনেকের অনেক আলাপচারিতা কানে আসে।

কারও হয়তো বিয়ে হয়েছে অনেক দিন হলো। বাচ্চা নেই। আগ বাড়িয়ে কেউ কেউ মেয়েটাকে বলে– ‘বাচ্চা নিতে এত দেরি করছ কেন? জলদি বাচ্চা নিয়ে নাও।’

সাথে সাথে আরেকজন ব্যঙ্গ করে বলে– ‘আরে বাচ্চা নেবে কি! ওদের তো বাচ্চা হচ্ছেই না। শুরুর দিকে বাচ্চা নিতে চাইত না, এখন আর চাইলেও হচ্ছে না; সবই আল্লাহর গজব!’

তারা লক্ষ করে না, সেই মেয়ের হাসি হাসি মুখটায় হঠাৎ-ই শ্রাবণের অন্ধকার। কোনো একটা ছুতোয় তিনি হয়তো সবার থেকে আড়াল খোঁজেন, আনমনে চোখের পানি ফেলেন।

আমার এক পরিচিত ভাই ছিলেন। মানুষটা দেখতে কালো, কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমান ও মেধাবী। ছোটোবেলায় দেখতাম, অনেকে তাকে ‘কালা’ বলে ডাকছে। ‘ওর নাম বাদ দিয়ে কালা বলছেন কেন?’ এই প্রশ্ন করলে অনেকে জবাব দিত– ‘আরে! আমরা তো ওকে আদর করে কালা ডাকি।’

পরিচিত সে ভাইটি সবার সামনে হাসি হাসি মুখ করে থাকতেন, কিন্তু আড়ালে তার চোখের পানির খবর হয়তো খুব কম মানুষই পেয়েছেন।

চেনাজানা আরেকজনের একটা বাচ্চা হলো। বাচ্চাটা প্রতিবন্ধী। তাই নিয়েও শুনি কেউ কেউ বাজে মন্তব্য করে, কটু কথা বলে। এই যেমন এক লোক আরেক লোককে বলছিল– ‘আরে জানেন তো, ওর বাচ্চাটা প্রতিবন্ধী।’

পাশের ভদ্রলোক সাথে সাথে জবাব দিলেন– ‘সবই পাপের ফল। সারা জীবন দুই হাতে কাঁচা পয়সা রোজগার করেছে। আল্লাহ উচিত শাস্তি দিয়েছেন। তাইতো কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না।’

আশেপাশে দেখেছি– মেয়ের রং কালো বলে বাবা-মাকে কত কথা শুনতে হয়। সহানুভূতিশীল কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে সমবেদনা জানান– 'আহহারে! এই মেয়েকে যে কী করে বিয়ে দেবেন! ওকে পার করতে তো অনেক কষ্ট পোহাতে হবে।'

অবাক ব্যাপার হলো– যেসব মেয়েদের নিয়ে আশেপাশের মানুষের এত এত সমবেদনা, তাদেরই অনেকে এখন স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে আছে। আর অনেক সুন্দর মুখশ্রীর মানুষের জীবন কাটছে বড়ো কষ্টে, বড়ো যন্ত্রণায়, হতাশায়।

চার

আল্লাহর রাসূলের একটি হাদিস আছে– 'যে আল্লাহ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে; নয়তো চুপ থাকে।'

কিন্তু আমরা! কখনো হাসি-ঠাট্টার ছলে, কখনো অহেতুক কৌতূহলে এমন অনেক অশোভন, বিশ্রী মন্তব্য করে বসি। ভাবি না, আমার এই কথা কিংবা আচরণ আরেকটা মানুষের মনে কী প্রভাব ফেলছে। তলিয়ে দেখি না, আমাদের একটি মন্তব্য ভেতরে ভেতরে সেই মানুষটিকে কীভাবে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

কারও রূপ, চেহারা, সাইজ নিয়ে কথা বলা অর্থহীন। এ এমন এক বিষয়, যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। এটা পুরোটাই আল্লাহ প্রদত্ত। তবে এ নিয়ে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা কেন? কেন হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপে অপদস্থ করা?

কারও সন্তান হওয়া না হওয়া, কারও বাচ্চা প্রতিবন্ধী হওয়া...আমরা কী করে জানলাম সব আল্লাহর শাস্তি, পাপের ফল? আল্লাহ কি আমাদের কাছে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন? নাকি আমাদের ওপর ওহি নাজিল হয়?

আলাপ জমাতে চাইলে হাজারটা বিষয় নিয়ে আলাপ করা যায়। মানুষের দুর্বলতা কিংবা কষ্টের জায়গা নিয়ে কথা না বললেই কি নয়?

তাই সবাইকে বলি, জীবনে কারও উপকার হয়তো নাই-বা করলেন, অন্তত কারও ক্ষতি যেন না হয়– সেদিকে খেয়াল রাখুন। খেয়াল রাখুন, আপনার কথা যেন কারও কষ্টের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

কাল হাশরের মাঠে আল্লাহর কাছে এই কথারও যে হিসাব দিতে হবে!